അലഹാരാ



কৃষণ চন্দর

অনুবাদ করেছেন

অবন্তী সান্যাল



ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস
৮৭, চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা

বঙ্গানুবাদের স্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশক
ধ্রুব মিত্র
ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস
৮৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা
মুদ্রাকর
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
রংমশাল প্রেস লিঃ
৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
প্রচ্ছদপট ও বর্ণলিপি
মাখন দত্তগুপ্ত
ব্লক-নির্মাণ
রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট
প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও
বই বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

দাম দেড় টাকা

প্রথম সংস্করণ ২৮শে জুন ১৯৪৬, ১১ই আষাঢ় ১৩৫৩

অনুবাদকের কথা

খ্যাতনামা উর্দু সাহিত্যিক কৃষণ চন্দরের 'অন্নদাতা' বাঙালী পাঠকের সামনে উপস্থিত করা গেল। প্রথমেই কুণ্ঠা বোধ করছি এই ভেবে যে মূল উর্দু থেকে বইখানি ভাষান্তরিত করবার সৌভাগ্য আমার ঘটে নি; উর্দু থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন খাজা আহম্মদ আব্বাস; বাংলা অনুবাদ ইংরেজির অনুসরণ।

আধুনিক উর্দু সাহিত্যে কৃষণ চন্দর বিশেষ সম্মানের সঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত। বয়স ত্রিশের কোঠায় পৌঁছোনোর আগেই তাঁর একাধিক গল্পগ্রন্থ, নাটক ও প্রবন্ধ সংকলন আত্মপ্রকাশ করেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সিকস্ত' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছে।

কৃষণ চন্দরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গতানুগতিকতাকে সচেষ্টভাবে এড়িয়ে সম্পূর্ণ নূতনতর ভঙ্গীতে নিজেকে প্রকাশ করা। এ বৈশিষ্ট্য আশ্চর্য রকমে প্রতিফলিত হয়েছে 'অন্নদাতা'য়। 'অন্নদাতা'র গল্পগঠনের ও প্রকাশ বৈচিত্র্যে কৃষণ চন্দর অদ্ভুত চমক লাগিয়েছেন।

তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ-লাঞ্ছিত বাংলাদেশ এর পটভূমিকা। এ দুর্ভিক্ষ আমাদের সমাজ জীবনের ভিত্তিতে ভূমিকম্পের ফাটল ধরিয়ে দিয়ে গেছে। এ দুর্ভিক্ষ মানুষের ইতিহাসে বিশেষ স্থান কালের গণ্ডীতে বাঁধা এক নিদারুণ ট্রাজিক অধ্যায়। মানবতা, জীবন-বোধ, নীতিবাদ ইত্যাদি সভ্যতার মূল প্রশ্নগুলিকে আমরা তেরশ

পঞ্চাশের চিতার আলোয় নতুন রূপে দেখবার দুর্ভাগ্য অর্জন করেছি। কেমন করে কতিপয়ের মুঠো অর্থনীতির বল্‌গা আয়ত্বে রাখে ; কেমন করে ক্ষেতের ফসল পরের গোলায় তুলে দিয়ে গ্রামের চাষী শহরের সড়ক ধরে দাক্ষিণ্যের আশায়; কেমন করে দুর্ভিক্ষের আঁচে মানুষের হৃদয়ের মাঝের আবরণ গলে গলে পড়ে ; তেরশ পঞ্চাশের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা সেদিন বিস্ফারিত চোখে দেখেছিলাম। আমরা দেখেছিলাম মানবতার কেমন করে অপমৃত্যু ঘটে।

কিন্তু মানবতার অপমৃত্যু ঘটে না এই হচ্ছে কৃষণ চন্দরের বিশ্বাস। যে সচল ইতিহাসের কর্ণধার জীবন্ত মানুষ—তারই আশা আকাঙ্ক্ষাই তো সভ্যতা সংস্কৃতি। মানবতা তারই মর্মকোষ। সে যুগে যুগে বর্বরের হাতে মার খায় ; তবু বর্বরতা কোনদিনই জয়ী হতে পারে না। রোম সাম্রাজ্যের অধিনায়কের দেহ এই কারণেই মানবতার পায়ের নীচে নিষ্পিষ্ট হয়; এই এক কারণেই প্রতাপশালী আর্য নৃপতিরও প্রয়োজন হয় আত্মগোপন করে অন্ধকারের আশ্রয় খুঁজতে। অগ্রসর ইতি-হাসের এই মূল সত্যটি 'অন্নদাতা'য় উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছে।

তিন অধ্যায়ে তিনটি পৃথক দৃষ্টিকোণে 'অন্নদাতা'র ভঙ্গী বিভক্ত। পরদেশী কূটনীতিক, দেশীয় ক্লীব আর মাটির মানুষ। তিনটি শ্রেণী-কেই দুর্ভিক্ষের সামনে ফেলে কৃষণ চন্দর ট্রাজেডীর ভয়াবহতা ফুটিয়ে তুলেছেন। এই ভঙ্গীতে ইনি সম্পূর্ণ একক। সর্বোপরি 'অন্নদাতা'র বৈশিষ্ট্য আবেগ—যে আবেগ সমগ্র অস্তিত্ব, জীবন-বোধ এবং বিশ্বাসকে আলোড়িত করে। যদি ভঙ্গী ব্যর্থও হত তবু এই সমৃদ্ধ আবেগই 'অন্নদাতা'র মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে দিত না।

এক

অঙ্কুশ

(কলকাতা থেকে কোন বিদেশী রাজদূতের তাঁর দেশের সরকারী বড়কর্তার কাছে লেখা কয়েকখানা চিঠি ।)

মুনশাইন ভিলা
কলিকাতা
৮ই আগস্ট ১৯৪৩

মহামহিমবরেষু,

সম্প্রতি কলিকাতায় পৌঁছিয়াছি। লোকে বলিয়া থাকে কলিকাতা ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শহর। ভারতবর্ষের অন্যতম আশ্চর্য হাওড়ার পুল। বাঙালীই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জাতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গণিকা-অঞ্চল 'সোনাগাছি'। কলিকাতার নিকটবর্তী সুন্দরবন শিকারী ব্যাঘ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচরণস্থল। কলিকাতা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাটের কেন্দ্র। কলিকাতার সর্বাপেক্ষা প্রিয় মিষ্টান্নের নাম 'রসগোল্লা'। শোনা যায় ইহার আবিষ্কর্ত্রী একজন গণিকা। কিন্তু সে ইহার কোন 'পেটেন্ট' পায় নাই। কারণ তদানীন্তন কালে ভারতীয় আইন বিধিতে এই ধরনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তাই বৃদ্ধ বয়সে সে ভিক্ষা করিতে করিতেই রাস্তায় মরে। অন্যত্র একটা পার্সেলে

হুজুরের জন্য দুই শত রসগোল্লা পাঠাইতেছি। মাংসের কিমার সহিত খাইলে অদ্ভুত ভাল লাগিবে।

আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য
হইবার গৌরবে গৌরবান্বিত
(স্বাঃ) এফ, বি, উল্লুসন
সাইলোরিকা রিপাবলিকের রাজদূত

কলিকাতা
৯ই আগস্ট ১৯৪৩

মহামহিমবরেষু,

আপনার মধ্যমা কন্যা সাইমারা একটি সাপ খেলানো বাঁশী চাহিয়াছিলেন। আজ একটি সাপুড়েকে রাস্তায় পাইয়াছিলাম। তাহার নিকট হইতে এক টাকায় অপূর্ব বাঁশীটি কিনিয়াছি। বাঁশীটি হালকা এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য করা। 'লাউ' নামক এক প্রকার ভারতীয় ফল হইতে নির্মিত। সম্পূর্ণ বাঁশীটিই হস্তনির্মিত। আমি ইহাকে মসৃন করাইয়াছি এবং ইহার জন্য একটী সুন্দর শালের বাক্স বানাইয়াছি। হুজুরের সম্মতিক্রমে হুজুরের মধ্যমা কন্যা সাইমারাকে ইহা উপহার হিসাবে পাঠাইবার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন।

আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য
(স্বাঃ) এফ, বি, উল্লুসন
সাইলোরিকার রাজদূত

আমাদের দেশের ন্যায় কলিকাতায় খাদ্য নিয়ন্ত্রণ নাই। খাদ্যের ব্যাপারে এখানে প্রত্যেকের পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে। গতকল্য টিল্লির দূতের ভোজসভায় নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। আমাদের টেবিলে ছিল বিভিন্ন মাংসের ২৬টি পদ। ইহা ছাড়াও ছিল ২৪ রকমের তরিতরকারী, স্যালাড এবং পুডিং। মদ ছিল সব চেয়ে সেরা। আপনি ত ভালভাবেই জানেন আমাদের দেশে পিঁয়াজ হইতে গাজরের টুকরা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত। কলিকাতায় কিন্তু কিছুই নিয়ন্ত্রিত নহে। এ বিষয়ে এখানকার মানুষগুলা সত্যিই ভাগ্যবান বলিতে হইবে।

এই ভোজসভায় একজন ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার উপস্থিত ছিলেন। আমাদের দেশে তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছেন। কথায় কথায় তিনি বলিলেন যে, কলিকাতায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। এই কথায় টিল্লির দূত হাসির তোড়ে ফাটিয়া পড়িলেন; সে হাসিতে আমাকেও অবশ্য যোগ দিতে হইয়াছিল। সত্য বলিতে কি এই সব শিক্ষিত ভারতীয়ের মত মূর্খ আর কেহই নাই। পুঁথিগত বিদ্যা ব্যতীত নিজের দেশে যা ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে ইহারা কিছুই খবর রাখে না। সত্য বলিতে গেলে, ভারতবর্ষের তিন ভাগের দুই ভাগ মানুষ দিনরাত ফসল আর সন্তান সৃষ্টি করিতেই ব্যস্ত। অবশ্য যুদ্ধের পূর্বে বহু ফসল বাহিরে রপ্তানী হইত; এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই শিশুদের পাঠান হইত কুলি হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। কিছু দিন হইল

কুলি চালান দেওয়া বন্ধ হইয়াছে; এবং ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিতে দেওয়া হইয়াছে স্বায়ত্ব শাসন।

আমার মনে হয় এই ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারটি বোধ হয় একজন ভয়ংকর প্রকৃতির বিপ্লবী। তিনি চলিয়া গেলে তাঁহার সম্বন্ধে টিল্লির রাজদূত মঃ জ্যান জ্যান ট্রিপকে বলিলাম। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন যে ভারতীয়েরা তাহাদের নিজের দেশ শাসনের একেবারেই অনুপযুক্ত এই সিদ্ধান্তেই তিনি পৌছিয়াছেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে মঃ জ্যান জ্যান ট্রিপের গভর্ণমেণ্টের বিশিষ্ট স্থান আছে বলিয়াই আমি তাহার কথায় সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি।

একান্ত অনুগত

(স্বাঃ) এফ, বি, উল্লুসন

১১ই আগস্ট ১৯৪৩

অদ্য প্রাতঃকালে আমি বোলপুর হইতে ফিরিলাম। সেখানে ডাঃ টেগোরের শান্তিনিকেতন দেখিলাম। উহারা বলে ইহা নাকি একটি বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে বসিবার একটি বেঞ্চিও নাই—ইহা হইতেই আপনি অনুমান করিতে পারিবেন কোন্ ধরনের শিক্ষা এখানে দেওয়া হইয়া থাকে। প্রফেসর, ছাত্র সবাই মাটিতে বসে। আমি ভাবিয়া আশ্চর্য হই যে তাহারা সত্য সত্যই কিছুমাত্র পড়াশুনা করে, না বসিয়া বসিয়া ঝিমায়। গরম ক্রমশ বাড়িতেছে

এবং গাছের উপরে চড়াইএর দঙ্গল বিশ্রী কিচির মিচির শুরু করিতেছে দেখিয়া বেশিক্ষণ থাকিতে পারি নাই।

এফ, বি, ইউ

১২ই আগস্ট ১৯৪৩

অদ্য চীনা দূতবাসে যাইবার সময় কে একজন দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করিল। কিন্তু আমি কোন প্রামাণিক সমর্থন পাই নাই। এই সম্পর্কে সকলেই বাংলা সরকারের বিবৃতির অপেক্ষায় আছি। যে মুহূর্তে বিবৃতি বাহির হইবে সেই মুহূর্তেই হুজুরকে সংবাদ পাঠাইব। কূটনীতিক কাগজপত্রের খামের মধ্যে হুজুরের মধ্যমা কন্যা সাইমারার জন্য একজোড়া ভারতীয় চটিজুতা পাঠাইলাম। এই জুতা সবুজ রংয়ের সর্প চর্মের দ্বারা নির্মিত। ব্রহ্মদেশে অসংখ্য সবুজ সর্প পাওয়া যায়। আশা করা যায় যে যখন ব্রহ্মদেশ বৃটিশ কর্তৃক পুনরধিকৃত হইবে তখন এই চটিজুতার ব্যবসা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইবে।

এফ, বি, ইউ

১৩ই আগস্ট ১৯৪৩

দূতাবাসের ঠিক বর্হিভাগে অদ্য দুইটি মৃত স্ত্রীলোককে দেখা গিয়াছে। তাহাদের কংকালসার দেহ দেখিয়া মনে হইল তাহারা 'হাড় শুকনো' ব্যাধিতে ভুগিয়াছে। বাংলা দেশে বোধ হয় সমগ্র ভারতবর্ষে এই হাড় শুকনো ব্যাধি ব্যাপক মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। এ এক আশ্চর্য এবং ভয়ংকর ব্যাধি। আক্রান্ত ব্যক্তি শীর্ণ হইতে হইতে

অবশেষে মারা যায়। যতদূর জানা যায় এই ব্যাধির কোন প্রতি-ষেধক আবিষ্কৃত হয় নাই। কুইনাইন বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। আসল কথা হইতেছে এশিয়ার গ্রীষ্মাঞ্চলের এই সব ব্যাধি—ইউরোপের ব্যাধি হইতে একেবারেই পৃথক। ইহা আরও প্রমাণ করে যে এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে কিছুমাত্র মিল নাই।

হুজুর পত্নীর দ্বিষষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে আমি বুদ্ধের একটী প্রস্তরমূর্তি পাঠাইতেছি। মাত্র দুই হাজার টাকায় আমি উহা ক্রয় করিয়াছি। ইহা বিন্দুসারের যুগের জিনিস এবং বেনারসের পবিত্র মঠে ইহা রক্ষিত ছিল। আশা করি ইহা হুজুর পত্নীর বৈঠকখানা ঘরের শোভাবর্ধন করিবে।

একান্ত অনুগত ভৃত্য

এফ, বি, ইউ

পুনঃ—দূতাবাসের বহির্ভাগে দৃষ্ট দুইটি মৃত স্ত্রীলোকের নিকট একটি শিশুকে পাওয়া গিয়াছে। শিশুটি মৃত মাতার শুষ্ক স্তন্য পান করিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়াছি।

১৪ই আগস্ট ১৯৪৩

অনাথ শিশুটিকে হাঁসপাতালের ডাক্তার ভর্তি করিতে অস্বীকার করিয়াছে। সুতরাং সে এখনো দূতাবাসেই আছে। কি করিব

আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। হুজুরের আদেশের অপেক্ষায় রহিলাম। টিল্লির রাজদূত যেখানে শিশুটিকে পাওয়া গিয়াছে সেখানেই রাখিয়া আসিতে উপদেশ দিয়াছেন কিন্তু আমাদের সরকারের সহিত আলোচনা না করিয়া এখন কিছু করা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না—যাহা পরিণামে গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যারূপে দেখা দিতে পারে।

এফ, বি, ইউ

১৬ই আগস্ট ১৯৪৩

আরো অনেকগুলি মৃতদেহকে দূতাবাসের বহির্ভাগে দেখা গিয়াছে। পূর্বপত্রে উল্লিখিত একই ব্যাধিতে ইহারা আক্রান্ত বলিয়া বোধ হইল।

নিঃশব্দে আমি শিশুটিকে মৃতদেহগুলির মধ্যে রাখিয়া পুলিশকে ফোন করিয়া দিয়াছি তাহারা যেন অবিলম্বে দূতাবাসের সম্মুখ হইতে ইহাদের অপসারিত করে।

আশা করি অদ্য সন্ধ্যার পূর্বেই তাহাদিগকে অপসারিত করা হইবে।

এফ, বি, ইউ

১৭ই আগস্ট ১৯৪৩

ইংরাজী দৈনিক স্টেটশম্যান এক সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলিয়াছে যে কলিকাতায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়াছে। কিছু দিন ধরিয়া উক্ত

পত্রিকা দুর্ভিক্ষে মৃত বলিয়া কথিত মানুষের ছবি ছাপাইতেছে। এখন পর্যন্ত প্রামাণ্য অভাবে বলা চলিতে পারে না যে এই সব ছবিগুলি খাঁটী কি জাল। দেখিলে অবশ্য মনে হয় ছবিগুলি হাড় শুকনো ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত মানুষেরই। কিন্তু সমস্ত বৈদেশিক দূতই তাঁহাদের মতামত প্রকাশ স্থগিত রাখিতেছেন।

২০শে আগস্ট ১৯৪৩

অবশেষে সরকার হাড় শুকনো ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষগুলিকে হাঁসপাতালে ভর্তি করিবার অনুমতি দিয়াছেন। শোনা যায় যে মাত্র এই কলিকাতা শহরেই দুই শতেরও উপর মানুষ প্রতিদিন এই ব্যাধিতে মারা যাইতেছে।

ইহা ব্যাপক মহামারীতে পরিণত হইয়াছে। কুইনাইনে কিছুমাত্র উপকার হইতেছে না দেখিয়া ডাক্তারেরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এমন কি ডায়াফোরেটিক মিক্সচার, ক্যাস্টর অয়েল, এবং এ্যাসপিরিন —এক কথায় ইংরাজের সমস্ত ডাক্তারী বিদ্যাই ব্যর্থ হইয়াছে।

কয়েকজন রোগীর রক্ত ইউরোপে পরীক্ষার জন্য পাঠান হইতেছে। কোন বিশেষজ্ঞকে এদেশে আমদানী করিবার সম্ভাবনা আছে। এমন কি একটী তদন্ত কমিটিও গঠিত হইতে পারে। যে কমিটী চার কি পাঁচ বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে তদন্ত করিয়া একটি রিপোর্ট দাখিল করিবে।

এক কথায় বলিতে গেলে, এইসব হতভাগ্যদের বাঁচাইবার জন্য সাধ্যানুসারে সমস্তই করা হইতেছে। মানুষ ইহার বেশী কিছু

করিতে পারে না। বাইবেলেই তো বলে, জন্ম আর মৃত্যু ভগবানের হাত।

বাংলা সংবাদপত্রগুলি পুনঃ পুনঃ বলিতেছে যে সমগ্র বাংলা দেশেই দুর্ভিক্ষ চলিতেছে এবং সপ্তাহে হাজারে হাজারে মানুষ অন্নাভাবে মারা যাইতেছে। কিন্তু আমাদের ঝি (সে নিজেই বাঙালী) বলে যে এই সব সংবাদপত্রগুলি ডাহা মিথ্যাবাদী। বাজারে গেলেই সে রন্ধনোপযোগী সমস্ত কিছুই পাইয়া থাকে। মূল্য অবশ্য বাড়িয়াছে কিন্তু যুদ্ধকালে ইহা তো অনিবার্য!

২৫শে আগস্ট ১৯৪৩

দুর্ভিক্ষের গুজবকে অদ্যকার রাজনৈতিক চক্রগুলি বিপরীত প্রমাণ করিয়াছে। বঙ্গীয় আইন পরিষদ যেখানে ভারতীয় সদস্যেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানকার মন্ত্রীরাই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিকে দুর্ভিক্ষ অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা যাইতে পারে না। ইহার অর্থ বর্তমানে খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের কোনই আশঙ্কা নাই। এখানকার বিদেশী রাজদূতমহল এই সংবাদে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে; কারণ যদি বাংলাকে দুর্ভিক্ষ অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হয় তবে অবশ্যই খাদ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। তাহা হইলে আমাদেরও অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

ফরাসী দূত মঃ জীনগ্যাল আমাকে গতকল্য বলিতেছিলেন আসন্ন খাদ্য নিয়ন্ত্রণের বিপদে পড়িবার আগে আমি যেন মদ মজুত করিয়া রাখি। আমি চন্দননগর হইতে মদ আমদানী করিব মনস্থ

করিয়াছি। শুনিয়াছি—ফরাসী ভারতে বহু বৎসরের পুরাতন মদ পাওয়া যায়। এমন কি ফরাসী বিদ্রোহের সময়কার পুরাতন মদও পাওয়া যায়। হুজুরের সম্মতি পাইলে নমুনা হিসাবে কয়েক বোতল পাঠাইয়া ধন্য হইব।

এফ, বি, ইউ

২৮শে আগস্ট, ১৯৪৩

গতকল্য এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে। আমার কনিষ্ঠ ভগিনী মারিয়ার জন্য নিউ মার্কেট হইতে কয়েকটি পুতুল কিনিতেছিলাম। একটি চীনা পুতুল মারিয়ার খুব পছন্দ হইল। ছয় টাকা দিয়া পুতুলটি কিনিয়া মারিয়ার হাত ধরিয়া যখন মোটরের দিকে যাইতেছিলাম তখন একটি মধ্যবয়স্ক বাঙালী স্ত্রীলোক নিকটে আসিয়া কোটের প্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া তাহার মাতৃভাষায় কি যেন বলিল। তাহার নোংরা হাত হইতে কোট ছাড়াইয়া লইয়া মোটরে উঠিয়া বাঙালী সোফারকে স্ত্রীলোকটি কি চায় জিজ্ঞাসা করিলাম।

সোফার তাহার সহিত বাংলায় কথা বলিতে শুরু করিল। তাহার কথার উত্তর দিবার সময় সে তাহার কোলের মেয়েটির দিকে আঙুল দিয়া দেখাইতেছিল। রুগ্ন শিশুটি—চীনা পুতুলের মতই কালো বড় বড় চোখে মারিয়ার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইতেছিল। তারপর বাঙালী স্ত্রীলোকটি অতি দ্রুত কি যেন বলিল, সোফারও অতি দ্রুত উত্তর দিয়া গেল।

'ও কি চায় ?' জিজ্ঞাসা করিলাম। সোফারটি স্ত্রীলোকটির

হাতে কয়েকটি পয়সা দিয়াই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। 'ও ওর মেয়েটাকে বিক্রি করতে চায় স্যর। মাত্র দেড় টাকায়।'

'দেড় টাকায়!' আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওতে যে একটা চীনা পুতুলও কেনা যায় না।'

'আজকাল ওর কমেও বাঙালী শিশুকে কিনতে পাওয়া যায়।' বিস্ময়ে আমি হতবাক হইয়া রহিলাম। তখনই আমার মনে পড়িয়া গেল সেই যুগের কথা—যখন আফ্রিকা হইতে নিগ্রো আমদানী করা হইত আমেরিকার দাস-বাজারে কেনা বেচার জন্য। সে সময় একটা সাধারণ নিগ্রোকে বিশ ত্রিশ ডলারের নীচে পাওয়া যাইত না। আমেরিকানরা কি ভুলই না করিয়াছে। আফ্রিকায় না গিয়া তাহারা যদি ভারতবর্ষে আসিত তাহা হইলে অনেক সস্তায় ক্রীতদাস পাইত। নিগ্রোর বদলে ভারতবাসী লইয়া কেনাবেচা করিলে কোটি কোটি ডলার বাঁচান যাইত। একটি মেয়ের মূল্য এখানে মাত্র অর্ধ ডলার। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ৪০ কোটি। তাহা হইলে আমেরিকা সমস্ত ভারতবাসীকে ২০ কোটি ডলারেই কিনিয়া লইতে পারিত। একবার ভাবিয়া দেখুন। আমাদের দেশে একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেও আমরা ইহার বেশী খরচ করিয়া থাকি।

আমার সোফার বলে যে সোনাগাছি (এখানে বেশ্যালয়গুলি স্থাপিত) রীতিমত মানুষ কেনাবেচার স্থান। শত শত মেয়েকে এখানে প্রতিদিন কেনাবেচা হইয়া থাকে। পিতামাতা বিক্রয় করে, বেশ্যারা কিনিয়া লয়; বাঁধা দর এক টাকা চার আনা। আর মেয়ে

যদি সুন্দরী হয় তবে চার টাকা পাঁচ টাকা হইতে দশ টাকা পর্যন্ত দাম পাইতে পারে। চালের দাম এখন এখানে টাকায় এক পোয়া। সুতরাং কোন পরিবার যদি দুইটি মেয়েকে বিক্রয় করিয়া দেয় তবে দুই এক সপ্তাহের জন্য নিশ্চিন্ত। আর বাঙালী পরিবারে গড়ে দুইটির বেশী মেয়ে আছেই।
আগামীকল্য কলিকাতার মেয়র আমাদিগকে এক ভোজসভায় নিমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। সেখানে আমরা কৌতূহলজনক আলোচনা আশা করিতেছি।

এফ, বি. ইউ

২৯শে আগস্ট, ১৯৪৩

কলিকাতার মেয়র বলিলেন যে বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে এবং অবস্থা ক্রমশই খারাপ হইয়া উঠিতেছে। আমাদের সরকারকে দিয়া সাহায্য পাঠাইবার জন্য তিনি আমার নিকট আবেদন জানাইলেন। আমি তাঁহাকে আমাদের সহানুভূতি জানাইলাম। অবশ্য ইহাও পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিলাম যে দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীন ব্যাপার এবং আমাদের সরকার অন্য দেশের জনসাধারণের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক নহেন। আমরা খাঁটী গণতন্ত্রের উপাসক। সুতরাং ভারতবাসীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। মরা বা বাঁচার ব্যাপারে তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। ইহা ব্যক্তিগত বড় জোর জাতীয় প্রশ্ন। আন্তর্জাতিক প্রশ্ন কখনই নহে। মঃ জ্যান জ্যান ট্রিপ আলোচনায়

যোগ দিয়াছিলেন ঝোঁকের মাথায় তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, 'যখন আপনাদের আইন পরিষদই বাংলাকে দুর্গত অঞ্চল ব'লে ঘোষণা করে নি, তখন আপনারা কেমন করে বিদেশের কাছে সাহায্য চান?'

এক কথায় মেয়র চুপ করিয়া গেলেন এবং "রসগোল্লা" খাইতে শুরু করিলেন।

এফ; বি, ইউ

৩০শে আগস্ট, ১৯৪৩

হাউস অব কমন্সে বিবৃতি প্রসঙ্গে ভারত সচিব মিঃ আমেরী ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা দেড়শত গুণ বাড়িয়াছে কিন্তু জমির ফসলের পরিমাণ বাড়িয়াছে অতি অল্পই। তাহার উপর ভারতবাসী খায় অত্যন্ত বেশী।

ইহা অবশ্য আমারও সিদ্ধান্ত হুজুর। এই সব ভারতবাসী যদিও দিনে দুইবার, কখনো কখনো বা একবার মাত্র খায়, কিন্তু যাহা খায় তাহা আমাদের পশ্চিম দেশের পাঁচবারের বেশী। মঃ জ্যান জ্যান ট্রিপের মত অনুসারে বাংলার মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইবার প্রধান কারণ হইতেছে তাহাদের এই ঔদরিকতা। তাহারা এত বেশী খায় যে, কখনো কখনো পাকস্থলী ফাটিয়া মরে। পাকস্থলী না ফাটে তবে প্লীহা ফাটে। এই স্থলে ইহাও স্মরণীয় যে ভারতবাসী ও ইদুরের জন্মহার পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এবং বহু ক্ষেত্রে এই দুই জনের পার্থক্য বুঝিয়া ওঠা দুষ্কর। যেমন

তাড়াতাড়ি জন্মায় তেমনিই তাড়াতাড়ি মরে। ইঁদুর যদি মরে প্লেগে, ভারতবাসী মরে হাড় শুকনো ব্যাধিতে। ইঁদুর শুধু প্লেগেই মরে ভারতবাসী মরে দুইটাতেই।

সে যাহাই হউক, যতক্ষণ পর্যন্ত ইঁদুর গর্তের মধ্যে থাকে, বাহিরে আসিয়া জগতের শান্তির ব্যাঘাত ঘটায় না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের তাহাদের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কোনই অধিকার নাই।

ভারত সরকারের খাদ্যসচিব স্বচক্ষে অবস্থা দেখিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। বাঙালীরা আশা করিতেছে যে বাংলায় যে সত্যই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে এবং এই ভয়ংকর ক্রমবর্ধমান মৃত্যুর হারের একমাত্র কারণ খাদ্যশস্যের ঘাটতি, বাঙালীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকারণে নহে—ইহা মাননীয় খাদ্যসচিবের চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়িবে।

এফ, বি, ইউ

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩

মাননীয় খাদ্যসচিব দিল্লী ফিরিয়া গিয়াছেন। আশা করা যাইতেছে যে তিনি তাঁহার বক্তব্য লাট সাহেবের নিকট উপস্থাপিত করিবেন।

এফ, বি, ইউ

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩

লণ্ডন সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত সংবাদ হইতে জানা যায় যে প্রত্যহ কলিকাতার প্রকাশ্য রাজপথে মানুষ মরিতেছে। কিন্তু

ইহা কাগজের খবর মাত্র। বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে— ইহার কোন সরকারী সমর্থন নাই। গতকল্য চীনা রাজদূত বলিতেছিলেন যে তিনি চীনে বাংলার দুস্থদের জন্য একটি রিলিফ ফাণ্ড খুলিতে চান, কিন্তু তিনি মনস্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কারণ কেহ বলে বাংলায় দুর্ভিক্ষ কেহ বলে দুর্ভিক্ষ নাই। আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'বোকামি করবেন না। এই খাদ্যশস্যের ঘাটতির কারণ ভারতবাসীর বেশী পরিমাণে খাবার অভ্যাস— যতদূর সম্ভব এই হচ্ছে একমাত্র সরকারী সিদ্ধান্ত। রিলিফ ফাণ্ড করে ওদের পেটুকপনা আরও বাড়িয়ে তুলবেন শুধু। এ শুধু নিছক বোকামি।' কিন্তু আমার যুক্তি চীনা রাজদূতের মাথায় ঢুকিল বলিয়া মনে হইল না।

এফ, বি, ইউ

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩

এই সমস্যা আলোচনার জন্য দিল্লীতে একটি সম্মেলন ডাকা হইয়াছে। আজ অনেক লোক মারা গিয়াছে। এই সম্পর্কে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে প্রাদেশিক সরকারগুলি—বিশেষ করিয়া বাংলা সরকার খাদ্য বিতরণ স্কীমের ফলে কয়েক লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছে।

এফ, বি, ইউ

২০শে অক্টোবর, ১৯৪৩

গতকল্য গ্রাণ্ড হোটেলে "বঙ্গ দিবস' প্রতিপালিত হইয়াছে। ইউরোপীয় সম্প্রদায় ব্যতীত, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী,

দেশীয় রাজন্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ককটেলবারে মদ ছিল প্রচুর। ম্যাদাম জুলিয়েট ট্রিপের সহিত আমি দুইবার নাচিয়াছিলাম। তাঁহার মুখ হইতে রসুনের গন্ধ পাইতেছিলাম। তিনি বলিতেছেন রিলিফের উদ্যোগে প্রায় নয় হাজার টাকা উঠিয়াছে। ম্যাদাম ট্রিপ অপূর্ব সুন্দরী। দুঃখের বিষয় তাঁহার ভারতীয় বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা অনেক; এইজন্য রাজদূত মণ্ডলীতে তাঁহার কদর কম। বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছি যে ভারতীয়দের প্রতি তাঁহার এই দুর্বলতার দরুণ তাঁহার স্বামীকে দেশে ফিরিয়া যাইবার পরোয়ানা আসিবে। উপস্থিত ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে স্নেহলতা নামে এক অপরূপ সুন্দরী মহিলাও ছিলেন। তাঁহার নাচ হইয়াছিল অতি চমৎকার।

এফ, বি, ইউ

২৬শে অক্টোবর, ১৯৪৩

বোম্বাই-এর জনৈক ভূতপূর্ব মন্ত্রী হিসাব করিয়াছেন যে বাংলায় প্রতি সপ্তাহে প্রায় এক লক্ষ লোক মরিতেছে। কিন্তু ইহা সরকারী হিসাব নহে।

অন্য দূতাবাসের সম্মুখে অনেকগুলি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। আমার সোফার বলিল উহারা একটি গোটা পরিবার। অন্নের সন্ধানে বরিশাল হইতে আসিয়াছে।

গতকল্য একটি সঙ্গীতজ্ঞের মৃতদেহ দেখিয়াছি। এক হাতে একটি সেতার আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, অন্য হাতে একটি শিশুর

খেলিবার কাঠের ঝুমঝুমি। একটি বাদ্য যন্ত্র ও একটি খেলনা। এই অদ্ভুত সামঞ্জস্যের কোন অর্থই করিতে পারি নাই।

হতভাগ্য ইঁদুরের দল। কেমন নিঃশব্দেই না ইহারা মরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলে না। পৃথিবীতে এত নিরীহ শান্ত ইঁদুরের পাল, আমার আর চোখে পড়ে নাই। শান্তির জন্য যদি কেহ নোবেল পুরস্কার পায়, তবে পাওয়া উচিত ভারতবাসীর। বিনা প্রতিবাদে তাহারা উপবাস করে, লাখে লাখে মরে। প্রাণহীন দৃষ্টিহীন চোখে শুধু আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে ; যেন বলিতে চায় 'হে ভগবান। আমাদের অন্ন দাও।'

হতভাগ্য সঙ্গীতজ্ঞের মৃত প্রস্তরীভূত নিশ্চল দৃষ্টিহীন চোখ দুইটি গতরাত্রে আমার ঘুমের মধ্যে বার বার হানা দিয়াছিল।

এফ, বি, ইউ

৫ই নভেম্বর ১৯৪৩

নূতন লাটসাহেব আসিয়াছেন। শুনিতে পাইলাম তিনি সৈন্য বাহিনীকে রিলিফের জন্য আদেশ দিয়াছেন এবং যাহারা রাস্তায় মরিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য শহরতলীতে ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই ক্যাম্পে তাহাদের সমস্ত প্রকার আরাম ও স্বাচ্ছন্দের সুবন্দোবস্ত করা হইতেছে।

এই সব ব্যাপারের পর মঃ জ্যান্ জ্যান ট্রিপ মনে করিতেছেন যে বাংলায় দুর্ভিক্ষের ব্যাপার সত্যও হইতে পারে। হাড় শুকনো ব্যাধির মড়ক বোধহয় সত্য নহে। ইহাতে বৈদেশিক দূতাবাস

গুলিতে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। আরবানিয়া, প্রিটানিয়া এবং টিরানিকার দূতেরা মনে করেন যে মঃ জ্যান্ জ্যান্ ট্রিপের এই প্রকার উক্তি আসন্ন যুদ্ধের ইঙ্গিত হইয়া উঠিতে পারে।

ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগত আশ্রয়প্রার্থীরা বড়লাটের স্কীমের উদ্দেশ্য চিন্তা করিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা জানিতে চায় বাংলাকে দুর্ভিক্ষ অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিলে তাহাদের ভাতার কি বন্দোবস্ত করা হইবে। বড়লাটের বিবৃতির ফলে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে সে বিষয়ে হুজুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ভারতবর্ষে ইউরোপীয় আশ্রয়প্রার্থীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমরা কি সংগ্রাম করিব না? পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার কি কি দাবী? স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে? এ বিষয়ে হুজুরের নির্দেশের অপেক্ষায় রহিলাম।

এফ, বি, ইউ

২৫শে নভেম্বর ১৯৪৩

অবশেষে মঃ জ্যান্ জ্যান্ ট্রিপ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে বাংলায় সত্যই কোন দুর্ভিক্ষ নাই। অবশ্য চীনা রাজদূতের স্থির বিশ্বাস বাংলায় দুর্ভিক্ষ আছে। যে উদ্দেশ্যে কলিকাতার দূতাবাসে আমাকে পাঠান হইয়াছিল আমি তাহা সিদ্ধ করিতে পারি নাই। এ জন্য আমি দুঃখিত। বাংলায় দুর্ভিক্ষ আছে কিনা এ বিষয়ে আমি একটিও প্রামাণ্য সমর্থন পাই নাই। তিন মাস আপ্রাণ অনুসন্ধান করিয়াও

আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। আমি লজ্জিত এবং হুজুরের ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

অধিকন্তু, আমি আবেদন করিতেছি যে আমি হুজুরের মধ্যমা কন্যা সাইমারার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছি এবং তিনিও আমার প্রতি প্রেমাসক্তা। এমতাবস্থায় আমাকে কলিকাতার দূতাবাস হইতে সরাইয়া লইয়া সাইমারার সহিত বিবাহের সম্মতি দিয়া অন্যত্র কোথাও রাজদূতের জেনারেল হিসাবে নিয়োগ করা কি হুজুরের উচিত নয়? হুজুরের এতাদৃশ দয়া প্রদর্শনের জন্য আমি অনন্তকাল কৃতজ্ঞ থাকিব।

এইসঙ্গে সাইমারার জন্য একটি মরকত মণির অঙ্গুরীয়ক পাঠাইবার ধৃষ্টতা মার্জনীয়।

এই অতি প্রাচীন ভারতীয় অঙ্গুরীয়কটি একদা সম্রাট অশোকের কন্যা ব্যবহার করিতেন।

একান্ত অনুগত ভৃত্য
(স্বাঃ) এফ, বি, উল্লুসন
সাইলোরিকার রাজদূত

দুই

মরা মানুষ

সকালে চায়ের টেবিলে খবরের কাগজ খুলতেই তার চোখে পড়ল বাংলার উপবাসী দুর্গতদের ছবিগুলো। তারা মরছে সর্বত্র রাজপথের ওপর, গাছের তলায়, অলিতে গলিতে, হাটে-বাজারে, খোলা মাঠে। তারা মরছে হাজারে হাজারে।

অমলেট খেতে খেতে সে ভাবতে লাগল কি ভাবে এই দুস্থদের সাহায্য করা যায়—এই সব হতভাগ্যের দল; নৈরাশ্যের চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এরা; মৃত্যুর ঘুমপাড়ানী গান ইতিমধ্যেই কানে পৌঁছে গেছে এদের। এদের আবার জীবনে ফিরিয়ে এনে রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলে, সত্যি সে বড় নিষ্ঠুর হবে, অমানুষিক হবে। কাগজের পাতাগুলো সে তাড়াতাড়ি উল্টে যেতে লাগলো। টোস্টের ওপর মার্মলেড ছড়িয়ে দিল। তাজা মুচ্‌মুচে টোস্টের আস্বাদকে শানিয়ে তুললো অম্লমধুর মার্মলেড,—যেমন করে নারীর সৌন্দর্যকে ধারালো ক'রে তোলে প্রসাধনের সৌরভ।

হঠাৎ তার মনে পড়ল স্নেহলতার কথা। সে এখনও এসে পৌঁছুল না, যদিও কথা ছিল তার সঙ্গে চা-পর্ব সারবে। বোকা মেয়ে এখনও হয়ত ঘুমুচ্ছে! কটা বাজল ?

ঘড়ি দেখল সে। সোনার ঘড়ির কালো সিল্কের ব্যাণ্ডটা তার মসৃণ ফরসা হাতের সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়েছে। সে মনে মনে ভাবলো একটা ঘড়ি, বোতাম আর টাই পিন এই হচ্ছে পুরুষ

মানুষের গয়না। আর মেয়েদের? গয়নায় তারা আপদমস্তক মুড়ে রাখে। কানে গয়না, পায়ে গয়না, কোমরে গয়না, নাকে, মাথায়, গলায়, হাতে গয়না। কিন্তু পুরুষদের বেলায় মাত্র তিনটে কেন? তাও আবার টাই পিন ফ্যাসানের বাইরে বলে আজকাল দাঁড়িয়েছে দুটোয়।

সমস্তাটি চিন্তা করতে করতে সে পরিজ খেতে শুরু করল। পরিজ থেকে উঠছে স্নুগন্ধি এলাচের সৌরভ। হঠাৎ তার ঘ্রাণে এলো আর এক মধুগন্ধ—যা স্নেহলতা তার সঙ্গে নাচবার সময় লাগিয়ে নিয়েছিল তার শাড়ী আর খোলা কাঁধে।

গত রাত্রির সেই মায়াজাল। সে দৃশ্য এখনও নাচছে তার চোখের সামনে। গ্রাণ্ড হোটেলে নাচা সব সময়েই চমৎকার! সে আর স্নেহলতা! এমন জুড়ি আর হয় না। তাদের দুজনের উপর সকলের দৃষ্টি ঠিকরে পড়ছে। কানে তার সোনার দুল। কর্ণপুট ঢাকা পড়েছে তাতে। ঠোঁটে হাসছে তার যৌবন আর 'অঙ্গরাগের' ইন্দ্রজাল, বঙ্কিম স্তনরেখায় মুক্তোর হার ঝলমল করছে, ফুলকি ঠিকরে পড়ছে; ঘুরছে, পাক খাচ্ছে,······অস্থির সাপের মত দুমড়াচ্ছে আবার শান্ত হয়ে পড়ছে। কি অদ্ভুত 'রুম্‌বা' নাচল সে। তার দেহের দোলা, তার জর্জেট শাড়ীর আবর্তন—যেন জ্যোৎস্নাচুম্বিত সমুদ্রের ঢেউ রূপোলী তটের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ঢেউ ধীরে ধীরে এগুচ্ছে, তীরকে স্পর্শ করছে, আবার সরে যাচ্ছে দূরে। বাজনা দ্রুত হয়ে উঠে আবার ক্ষীণতর হয়ে আসছে। ধীরে—অতি ধীরে তরঙ্গ জ্যোৎস্নায়

ধোয়া সমুদ্রতটে চুমু খেয়ে যাচ্ছে।······স্নেহলতার ঠোঁট দুটো আধখোলা, তার দাঁতগুলো মুক্তোর মত ঝক ঝক করছে······হঠাৎ আলোগুলো নিভে গেল। ঠোঁটে ঠোঁট, দেহে দেহ, নিমীলিত চোখ, —স্নেহলতা আর সে বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচছে। সেই ঢেউএর শিথিল জোয়ার ভাটা, সেই মধুর মন-মাতানো ঝড় নাচাচ্ছে এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক।······

আপেল টুকরো টুকরো ক'রে সে কাঁটা দিয়ে আলগোছে তুলে নিল একটা টুকরো। চা ঢাললো আর এক কাপ। ভাবতে লাগলো, 'কি নিখুঁত স্নেহলতার দেহ, কি সুন্দর মন, একেবারে সাদাসিদে।' অতিবুদ্ধি মেয়েদের পছন্দ হয় না তার। তারা সব সময় তর্ক করছে, সমাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, মার্কসবাদ, স্বাধীনতা, শিক্ষা আর জীবিকা নিয়ে। এই হচ্ছে আধুনিকা। মেয়ে নয়ত দর্শনের মোটা কেতাব। এমন মেয়ে বিয়ে করার চেয়ে এরিস্টটল পড়েই দিন কাটান ভাল।

অধৈর্য হয়ে সে আবার তাকাল ঘড়ির দিকে। স্নেহলতা এখনো এল না। চার্চিল, রুজভেল্ট আর স্টালিন মিলেছেন তেহরানে, পাল্টে দিচ্ছেন পৃথিবীর মানচিত্র আর লক্ষ মানুষ মরছে বাংলা দেশে। মানবতা উপহার পাচ্ছে আটলাণ্টিক সনদ—আর বাংলায় আজ এক কণা চাল নেই। ভারতবর্ষের দুঃখে সে অভিভূত হয়ে পড়ল। চোখ ভরে এল জলে। সে ভাবল: আমরা দরিদ্র, আমরা অসহায়, আমরা দুস্থ, শোষিত। আমাদের ঘর সেই কবি মীরের ঘরের মত—যিনি কেঁদে বলেছিলেন—

"দেয়াল ধ্বসে পড়ছে আর চাল থেকে ঝরে পড়ছে বেদনার অশ্রু-জল।" তার মনে হলো এই ভারতবর্ষ চিরকাল কাঁদছে। কখনো অন্ন নেই, কখনো বস্ত্র নেই। কখনো অনাবৃষ্টি, কখনো বা অতিবৃষ্টি। কখনো মহামারী, কখনো দুর্ভিক্ষ। আজ তাকাও বাংলার সন্তানদের দিকে। অস্থিসার চোখে চিরকালের বিষণ্ণতা, আর মুখে ভিক্ষুকের আর্তি। ফ্যান দাও, প্রাণ দাও।

হঠাৎ তার মুখে চা বিষিয়ে উঠলো। মন ঠিক করে ফেলল সে। সে এগিয়ে যাবে, দেশের মানুষকে সাহায্য করবে, চাঁদা তুলবে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াবে, বক্তৃতা দিয়ে দেশবাসীর ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তুলবে। সভা-সমিতি! শোভাযাত্রা! স্বেচ্ছাবাহিনী! চাঁদার পাহাড়! বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত প্রাণস্পন্দন বয়ে যাবে দেশে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। হঠাৎ সে যেন দেখতে পেল কাগজে তার নাম বড় বড় অক্ষরে। প্রত্যেকটি কাগজ তার দেশ-প্রেমের জয়গান গাইছে। যে কাগজটা সে পড়ছে তাতেই যেন দেখতে পেল তার নিজের ছবি—খদ্দর পরা, জওহরলালের মত কোর্তা গায়ে আর তাঁরই মত মিষ্টি হাসি মুখে।

হ্যাঁ, এই হবে। সে চেঁচিয়ে চাকরকে ডেকে আর একটা অমলেট আনতে বলল।

আজ থেকে সে তার জীবন ধারা পাল্টে ফেলবে। তার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত সে ব্যয় করবে এই সব উপবাসী, জীর্ণ-বাস, মৃত্যুন্মুখ দেশবাসীর হিতার্থে। তার জীবনটাই সে এদের জন্য

উৎসর্গ করবে। হঠাৎ সে দেখতে পেলে যেন অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী। তাকে নিয়ে যাচ্ছে ফাঁসির মঞ্চে। তার গলায় ঝুলছে ফাঁসির রশি। মাথায় পরিয়ে দিয়েছে কালো টুপি। তার ভেতর দিয়েই সে যেন চেঁচিয়ে বলল: 'আমার অভুক্ত দেশবাসীর জন্যেই আমি প্রাণ দিচ্ছি।' কথাগুলো ভাবতেই তার চোখ আবার জলে ভরে উঠল। আর দু-ফোঁটা গরম লোনা জল চায়ের কাপে ঝরে পড়ল। রেশমী রুমালে সে মুছে ফেলল চোখের জল।

একখানা মোটরগাড়ী বারান্দায় এসে থামল। সে দেখল স্নেহলতাকে। মোটরের দরজা খুলে সে হাসি মুখে সিঁড়ি বেয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

"হ্যালো" স্নেহলতা সম্ভাষণ করল। বাহুতে গলা জড়িয়ে ধরে সুরভি ঠোঁট তার গালে ছুঁইয়ে দিল। আলো, উষ্ণতা, আনন্দ সব কিছু মেশানো তার হাসি। তাতে অবশ্য বিষও আছে। বিষ আছে তার চোখে, বিষ আছে তার ঠোঁটে, তার পিঠের বঙ্কিমতায়, তার তনু দেহে, তার কালো চুলের রাশিতে, বিষ আছে তার প্রত্যেক রোমকূপে। সে যেন অজন্তার একখানা ছবি যার প্রত্যেক দেহরেখা শিল্পীর বিষাক্ত তুলিতে আঁকা।

"চা খাবে?" সে জিজ্ঞেস করল।

"না। ধন্যবাদ—খেয়েছি।" তার চোখে জল দেখে স্নেহলতা জিজ্ঞেস করল "কি হয়েছে গো।"

"কিছু না, কিছু না। এইমাত্র বাংলার দুস্থদের কথা পড়ছিলাম। স্নেহলতা বাংলার জন্যে আমাদের কিছু করা উচিত।"

"হায়রে কপাল!" সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল তারপর পকেট আয়না দিয়ে লিপস্টিকটা ঘসে নিয়ে সে বলল "ভগবানের কাছে ওদের আত্মার শান্তির জন্যে প্রার্থনা করা ছাড়া আমরা আর কি করতে পারি বলো?"

"এইতো ঠিক কথা!" উত্তেজনায় সে চেঁচিয়ে উঠল। "প্রত্যেক মন্দিরে, মসজিদে মৃত্যুন্মুখ উপবাসী বাংলার জন্য প্রার্থনা হোক। চমৎকার প্রস্তাব! স্নেহলতা, তুমি সত্যিই অসাধারণ।"

"হাজার হলেও কনভেন্টে পড়েছিতো।" স্নেহলতা তার অপরূপ সুন্দর দাঁত দেখিয়ে হেসে বলল।

সে কিছুক্ষণ ভাবল তারপর বলল "কিন্তু—কিন্তু আমাদের একটা প্রস্তাব পাশ করাতে হবে।"

"কেন?" শাড়ীর প্রান্ত ঠিক করতে করতে স্নেহলতা জবাব দিল।

"আমি অবশ্য ঠিক বলতে পারব না" উত্তর দিল সে। "কিন্তু আমি জানি দেশের যখনই কোন বিপদ ঘটে একটা প্রস্তাব তখন পাশ করাতেই হয়। শুনেছি প্রস্তাব পাশ করালেই নাকি সমস্ত বিপদ কেটে যায়···আমি বরঞ্চ কোন বিখ্যাত নেতাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করি এ ব্যাপারে কিসে সব চেয়ে ভাল হয়।"

"ভুলে যাও গো, ওসব ভুলে যাও।" বাঁকা হাসি হেসে স্নেহলতা বলল, "আমার খোঁপায় কেমন মানিয়েছে ফুলটা বলত?"

খোঁপা করা চুলের গোছায় গোঁজা নীলরাজ ফুলের বোঁটায় মৃদু চাপ দিয়ে সে বলল, "চমৎকার ফুল। নীলকৃষ্ণের গায়ের রং, গোখরার ফণার মত। বিষের মত রং।"

তারপর মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ থেকে সে বলল "না না একটা প্রস্তাব পাশ করাতেই হবে। কাউকে ফোনে ডাকি।"

হাতটা একটু উঠিয়ে স্নেহলতা তাকে বাধা দিল। তার আঙুলের মৃদু স্পর্শে দেহের প্রতি রোমকূপ আর স্নায়ুর ভেতর দিয়ে মসৃণ, শিরশিরে অনুভূতি খেলে গেল। আবেগের ভঙ্গুর ঢেউ যেন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

"কালকে 'রুম্‌বা' অপূর্ব হয়েছিল কি বল!" আলতো চুমুর সঙ্গে মনে করিয়ে দিল স্নেহলতা।

আবার পিঁপড়ের ফৌজ, যেন তার মগজের ভেতরে পথ করে নিচ্ছে। ঐ সব দুর্গতের দল হাজারে হাজারে মনের সামনে ভীড় করে আসছে। তাদের দূরে সরিয়ে দিতে গিয়ে হার মানল "আমাকে বলে দাও স্নেহলতা। প্রস্তাব পাশ করবার পর কি আমরা করব?" আমার মনে হচ্ছে দুর্গত অঞ্চলগুলো দেখে শুনে আসা উচিত। তোমার কি মত?"

"ওটার অত গুরুত্ব দিচ্ছ কেন গো।" সন্ত্রস্ত কণ্ঠে স্নেহলতা বলল। "এ করতে গেলে তুমি অসুখে পড়বে যে। মরুগগে ওরা। যাই কর না হতভাগারা মরবেই। শান্তিতে মরতে দাও ওদের। এ নিয়ে তুমি এত তেতে উঠছো কেন?"

"না, না। দুর্গত অঞ্চলে যেতেই হবে আমাকে। যেতেই হবে। তুমিও যাবে আমার সঙ্গে। যাবে না, স্নেহলতা?"

"কোথায়?"

"গ্রামে গ্রামে।"

"যেতে তো অনিচ্ছা নেই! কিন্তু থাকবো কোথায়? ওখানে ভাল হোটেল আছে কি?"

হোটেল! এই একটি কথা তার সমস্ত স্কীম ভেস্তে দিল। সে এটাকেও চাপা দিয়ে রাখল তার মনের গহ্বরে যেখানে আরো অনেক আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের কবর রচিত হয়ে আছে।

অভিমানী শিশুর মত মুখ ভার করে চুপ চাপ বসে রইল সে।

নীরবতা ভাঙল স্নেহলতা। "এবারে আমি বলছি, আমাদের কি করা উচিত। এস গ্রাণ্ডে বিরাট একটা নাচের ব্যবস্থা করি। প্রবেশমূল্য মাথা পিছু পঞ্চাশ। মদের দাম আলাদা, যা উঠবে, সব রিলিফ ফাণ্ডে যাবে।"

এবারে সে লাফিয়ে উঠল, আবেগে জড়িয়ে ধরল স্নেহলতাকে।

"এই জন্যেই কি কাল রাত্রে কথাটা তুলেছিলে?" হাসতে হাসতে স্নেহলতা বলল।

"তুমি কি উত্তর দিয়েছিলে?"

"আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম।" কুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করল স্নেহলতা।

"মদ একটু বেশী খেয়ে ফেলেছিলাম তখন।" সে উত্তর দিল।

মোটরখানা মিওনিরাম, জেভ্‌নিরাম, ভেগোমল, সিগারেটের দোকানগুলো ঘুরে অবশেষে ব্রেকের আর্তনাদ তুলে থেমে গেল। ঠিক উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে গ্রাণ্ড হোটেল—বিরাট, জমকালো একটা মোগল স্তম্ভের মত।

"এ দুদিন খেতে পাইনি, কিছু খেতে দাও।" ময়লা ছেঁড়া ধুতি পরনে একটা বাঙালী ছেলে রাস্তায় ভিক্ষে করছে। তার সঙ্গে একটি বাচ্চা মেয়ে ধুলো আর ঘামে কদাকার দেখাচ্ছে। বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিল স্নেহলতা।

"মেম সাব একটা পয়সা দাও---বড়ো ক্ষিদে পেয়েছে।"

ছেলেটি করুণস্বরে ঘ্যান ঘ্যান করছে।

"তোমার জন্যে কী সিগ্রেট আনব?" সে জিজ্ঞেস করল।

"টার্কিশ।" উত্তর দিল স্নেহলতা।

দোকানে ঢুকলো সে। গাড়ীতে বসে রইল স্নেহলতা। বাংলার ক্ষুধিত মৌমাছিগুলো গুন গুন করে ফিরছে তার মাথার ভেতরে। মেম সাহেব! মেম সাহেব!! মেম সাহেব!!!

সে তাদের ধমকে উঠল। একবার---দুবার। কিন্তু ক্ষুধাকে কি অত সহজে তাড়ান যায়। বাচ্চা মেয়েটি ভীত পদে এগিয়ে এল, তার শাড়ীর আঁচল ধরে করুণ আবেদন জানাতে লাগল, "মেম সাব, মেম সাব···মেম সাব।"

রাগের মাথায় সে ভিখিরী মেয়ের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল আঁচলটা। সেই মূহূর্তে সে ফিরে আসতেই স্নেহলতা বলে উঠল, "ভিখিরীগুলো জঘন্য---অতি জঘন্য। শহরের বাইরে পাঠিয়ে দেবার জন্যে কিছু করতে পারে না কর্পোরেশন? যতক্ষণ তুমি দোকানে ছিলে ওরা আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে।"

ছেলেটির গালে সে সশব্দে চড় কষিয়ে দিল। ধূলোয় জটধরা চুলের মুঠো ধরে মেয়েটিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল।

তারপর স্টার্টারে চাপ দিতেই মোটরখানা গ্রাণ্ড হোটেলের বারান্দা থেকে পিছলে বেরিয়ে গেল।
রাস্তার ওপরে পড়ে মেয়েটি কাঁদতে শুরু করে দিল। ছেলেটি এগিয়ে গেল বোনের কাছে। তাকে তুলে ধরে সস্নেহে বলল "তোমার কোথাও লাগেনি ত?" অসহায়ের মত কেঁদেই চলল মেয়েটি।

নাচ তখন চরমে উঠেছে।
স্নেহলতা আর সে পা দুটোকে জিরিয়ে নেবার জন্যে বসে ছিল।
"কত টাকা তুলেছি আমরা?" জিজ্ঞেস করল স্নেহলতা।
"ছ হাজার পাঁচশ।"
"সবেত সন্ধে। রাত্তির চারটের মধ্যে······
"ন-হাজার তুলে ফেলতে পারি, দশহাজারও হতে পারে।"
"তুমি কিন্তু ভীষণ খেটেছ?" স্নেহলতার হাত তার আঙুলগুলোয় মৃদু চাপ দিল।
"তুমি কী নেবে?"
"তুমি কী নেবে?"
"একটা জিন আর সোডা।"
স্নেহলতা অর্ডার দিল "বেয়ারা, সাহেবের জন্যে একটা বড় জিন আর সোডা।"
"তোমার জন্যে কী আনবে?"

"নাচ আর মদ গেলা, মদ আর নাচ---ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

"দেশের জন্যে কষ্ট করতে হয় গো।" স্নেহলতাকে সে একটু আশ্বাস দিল।

"সত্যি বলছি, সাম্রাজ্যবাদকে বড়ো ঘেন্না করি আমি।" আন্তরিকতায় ভেজা সুরে স্নেহলতা বলল। "বেয়ারা, আমার জন্যে একটা ভারজিন।"

বেয়ারা মদের বোতল তার সামনে রেখে গেল।

সে বোতলটা ঝাঁকিয়ে নিতেই মদ হ'য়ে উঠলো ভোরের অরুণ-চ্ছটার মত গোলাপী। আলোর সামনে গ্লাস তুলে ধরতেই পদ্মরাগের মত ঝল্‌মল্‌ করে উঠলো। তার আঙুলের ফাঁকে ধরা পদ্মরাগ কাঁপতে লাগল—রক্তের মত লাল রং সে পদ্মরাগের।

সে আর স্নেহলতা আর একবার নাচের জন্য উঠল। এক সুর, এক তাল, এক লয়। আর সব হারিয়ে গেছে সমুদ্রে—দূরে—বহুদূরে। আকাশের অসীম বিস্তারের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে পৃথিবীর চিহ্ন। তারায় ভরা আকাশে উড়ে চলেছে তারা দুজন। তার কাঁধের উপর স্নেহলতার গাল; স্নেহলতার চুলের মৃদুগন্ধ তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অগোচরে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। সত্যিই সুন্দর তার চুল বাঁধার ধরন—কত বিচিত্র গড়ন। যে সব মেয়েরা দু একটা বাঁধা ধরা ফ্যাসানেই সন্তুষ্ট স্নেহলতা এ ব্যাপারে তাদের চেয়ে পৃথক। প্রসাধন স্নেহলতার কাছে একটা আর্ট। শিল্পী যেমন করে তার সমস্ত মন, তার নিবিষ্টতা ঢালে তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির পিছনে--- স্নেহলতাও ঠিক তেমনিভাবে মনপ্রাণ ঢেলে দেয় তার চুলের পিছনে।

একদিন তার চুল হয়ে ওঠে একটা ফুটন্ত পদ্ম, অন্যদিন কানের পাশে কুঞ্চিত হ'য়ে থাকা চুল দেখাবে ঠিক গোখরোর ফণার মত। কখনো বা মনে পড়িয়ে দেবে চন্দ্রকলাকে। আবার পরের দিন দেখ্‌বে ঠিক যেন হিমালয়ের উৎরাই আর চড়াই দেখাবে।

চুলের সৌন্দর্য আর শিল্প সৌকর্যে স্নেহলতার নিজস্বতা এত বেশী যে তার মনে হয় স্নেহলতার বুদ্ধিটুকু মগজে নেই, আছে তার ওই চুলে……

নাচ উঠ্‌লো উঁচু পর্দায়। স্নেহলতার চুল ব্যর্থ আশ্বাসে এসে লাগছে তার গালে। তার প্রত্যেক অঙ্গে উঠছে নাচের ছন্দ। তার আর স্নেহলতার দেহ কামনার বহ্নিতে গলে এক হয়ে গেল। বহ্নি-শিখার মত নাচের তালে ছুলছে তারা। একটি বহ্নিশিখা একটি গোখরো সাপ! একটি ঢেউ……ঢেউয়ের পর ঢেউ……উষ্ণ নিবিড় ঢেউ, বালুতটে আলতো চুমু খেয়ে ফিরছে; মিহি সুরে ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে ফিরছে; ঘুমোও, ঘুমোও বন্ধু। মৃত্যু জীবনের মূলতত্ত্ব। নড়ো না। কথা কয়ো না। ভাববার দরকার নেই। শান্তি জীবনের সার পদার্থ। মুক্তির কথা ভেবে অধীর হয়ো না। দাসত্বই জীবনের সর্বস্ব।

নাচের হলে চারদিক ঘিরে মধুর বিষের আমেজ……মদে বিষ ……সংগীতে বিষ……বিষ রয়েছে নারী দেহে। বিষ আর ঘুম আর স্নেহলতার আধ-খোলা ঠোঁট……বিষ নাচের ছন্দে, ঘুমোও, ঘুমোও বন্ধু ঘুমোও……অনন্তকালের জন্যে ঘুমোও ……হঠাৎ আলোগুলো নিভে গেল; স্নেহলতার ঠোঁটে তার ঠোঁট

দেহে দেহ, ধীরে ধীরে……অতি ধীরে সে দুলছে বাজনার তালে এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক। মহাকালের কোলে সে হারিয়ে গেল। সে ডুবে মরল তার ভিতরে। ঘুমিয়ে পড়ল মৃত্যু হল তার।

তিন

মৃত্যুঞ্জয়

আমি কি মরে গেছি? না, বেঁচে আছি?……আমার দৃষ্টিহীন, প্রাণহীন চোখ দুটো আকাশের অসীম বিস্তারের মধ্যে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে?

পুলিশ, সেবা সমিতি কিংবা আঞ্জুমানের লোকেরা আমার মৃতদেহকে সরিয়ে নিয়ে যাবার আগে, কবর দেবার কিংবা দাহ করবার আগে এই দূতাবাসের সিঁড়িতে একবার বসো; শোনো আমার কাহিনী।

ঘৃণা আর বিরক্তিতে পালিয়ে যেও না। আমিও মানুষ তোমারই মত—রক্ত মাংস আর হাড়ের তৈরী জীব। আজ অবশ্য মাংসের চেয়ে হাড়ই বেশী, গ্রন্থিগুলো পচতে শুরু করেছে; আর তা থেকে বেরুচ্ছে ন্যক্কারজনক গন্ধ। সত্যি কথা।

তোমার ও আমার দেহের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এই যে, আমার হৃৎপিণ্ড আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে; মগজ হয়েছে নিষ্ক্রিয় আর দীর্ঘ দিনের উপবাসে পাকস্থলী কুঁকড়ে বসে গেছে। শোনো আমি মরে গেছি কিন্তু আমি এত ক্ষুধার্ত যে মনে হচ্ছে যদি আমার পেটে একটা ভাতের কণা দিতে পারো, তবে তখনই এ মৃতদেহ আবার বাঁচবার জন্য গা ঝাড়া দিয়ে উঠবে। বিশ্বাস না হয় দিয়ে দেখো! কিন্তু যাচ্ছো কোথায়? চলে যেও না বন্ধু, একটু দাঁড়াও। তামাসা করছিলাম। মরা মানুষ আবার ভাত চায় দেখে ঘাবড়ে গেলে!

দোহাই বলছি যেও না। শুনে যাও আমার কাহিনী। ও চালের কথা ভেবে ব্যস্ত হয়ো না। ও তোমার হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা থাক। আমার শরীর পচতে শুরু করেছে তাই তোমার কাছে আর ভাত চাইব না। এ দেহের আজ এক কণা চালের আর কোনো প্রয়োজনই নেই। এ দেহই একদিন এক কণা চাল হয়ে যাবে। নরম উষ্ণ মাটির বুকে মিলিয়ে যাবে এই দেহ। মাটিতে ধানের বীজ শেকড় গাড়বে। তারপর একদিন স্বল্প জলের আস্তরণের ঊর্ধ্বে মাথা তুলবে, বাতাসে সবুজ শিষগুলি দুলতে থাকবে। মুখ টিপে হাসবে; হাসিতে ফেটে পড়বে; নরম রোদের সঙ্গে খেলা করবে; জোৎস্নার হিমধারায় করবে স্নান; কান পেতে শুনবে পাখীদের কলকাকলী। হালকা হাওয়া এসে চুমু দিয়ে যাবে। আর তখন তার অণুতে অণুতে জন্ম নেবে এক নতুন রূপ, নতুন গান, নতুন জীবন। এক কণা চাল। হ্যাঁ, ছোট ছোট খোসার আবরণে একটি ক'রে চালের কণা—স্বচ্ছ, শুভ্র, সুন্দর —শুক্তির ভেতরে একবিন্দু মুক্তোর মত।

আজ তোমাকে একটা গোপন কথা বলব, মানুষের জীবনের সব চেয়ে গোপন কথাটি যা একমাত্র মরা মানুষেই বলতে পারে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো তিনি তোমাকে যেন মানুষ না করে একটি চালের কণায় পরিণত করেন। প্রার্থনা করো, সনির্বন্ধ অনুরোধ করো, মিনতি জানাও, তপস্যা করো—. তোমাকে মানুষ থেকে এক কণা চালে পরিণত করবার জন্য—

সর্বস্ব দিয়ে বিধাতাকে আবেদন জানাও। জীবনতো মানুষের মত চালের কণারও আছে। কিন্তু তার জীবন অনেক বেশী মহৎ, অনেক নিষ্কলুষ, অনেক পবিত্র, অনেক সুন্দর। প্রাণটুকু ছাড়া মানুষের আর কিই বা আছে? মানুষের সম্পদ ত তার দেহ নয়; বাড়ীঘর ধনদৌলত নয়—সম্পদ হল তার প্রাণ ও আত্মা। বাকী যা কিছু দেহ, জমিজমা, ধনদৌলত ব্যবহারের পর পিছনে ফেলে যায়। কিন্তু তার মনে আঁকা থাকে কয়েকখানা ছবি, কয়েকটি স্মৃতির টুকরো, ধিকি ধিকি জ্বলা আগুনের উত্তাপ, হয়ত একটি হাসির রেখা। এগুলো নিয়েই মানুষ বাঁচে, আর মরবার সময় এগুলোই নিয়ে যায় সঙ্গে করে।

চালের কণার জীবনকথা তোমায় বলেছি। এইবার শোনাব আমার জীবন-কাহিনী। বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিও না। আমার দেহের মৃত্যু হয়েছে জানি, কিন্তু আমার আত্মা এখনও বেঁচে আছে। চিরনিদ্রায় এও ঢলে পড়বার আগে আমার আত্মা তোমাকে শোনাতে চায় সেই সব দিনের কথা যখন দেহ আর আত্মা এক সঙ্গে চলতো, কথা কইতো, হাসতো, বেঁচে থাকতো।

দেহ আর মন। দুয়ের মিলনেই প্রাণ; এ দুয়ের মিলনেই আনন্দ, প্রেরণা, সৃষ্টি। মাটি আর জল যখন মেলে তখনই সৃষ্টি হয় চালের কণা। নর আর নারীর যখন মিলন হয়, জন্ম নেয় এক হাস্যমুখর শিশু। দেহ আর মন যখন এক হয় তখনই জীবন। বসো—তোমাকে আমাদের দু'জনের গল্প শোনাই—আজ যারা চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। দেহ আর

মন—পার্থক্য শুধু এই দেহ মরলে হয় দুর্গন্ধ; আর মন যখন মরে সে দেয় ধোঁয়ার কুণ্ডলী। যদি ভাল করে দেখ তবে দেখতে পাবে সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে কেঁপে কেঁপে জ্বলে জ্বলে ওঠা আমার অতীত দিনের আবছা স্মৃতিগুলোকে।...... বিদ্যুতের ওই ঝলকটা কি জানো? ও হল আমার বৌয়ের হাসি......হ্যাঁ, ওইত আমার বউ......লজ্জা কি? এগিয়ে এস বন্ধু! এইবার দেখতে পাচ্ছ এই নিষ্কলুষ সৌন্দর্য, এই একরাশ কালো চুল, লজ্জা-নম্র হাসি, এই আনত কোমল চোখ দুটো—এইত সেই মেয়ে তিন বছর আগে জেলেদের গ্রাম আতাপাড়ার সমুদ্রতীরে যাকে প্রথম দেখেছিলাম। তখন আজতের জমিদারের মেয়েকে আমি সেতার শেখাতাম। দু'দিনের ছুটিতে পিসীকে দেখতে গিয়েছিলাম আতাপাড়ায়। নির্জন সমুদ্রপারে তাল আর বাঁশের সার দিয়ে ঘেরা এই শান্ত গ্রামখানা তখন ঢাকা পড়েছিল এক বিষন্ন চাপা নিস্তব্ধতায়।

জানি না বাংলার গ্রামে গ্রামে কেন এ বিষাদ। এখানকার মাটি নিথর, নিস্তব্ধ। দূর-বিস্তৃত অতলান্ত সমুদ্র, কূলহীন, সীমাহীন, বাঁশের কুঁড়েগুলো অন্ধকার—শুধুই অন্ধকার, বিষাদ আর অবসন্নতা। শুকনো মাছের গন্ধ বাতাসে। গ্রামের পুকুর সবুজ শ্যাওলায় ঢাকা। ধানের ক্ষেতে থমকে আছে সামান্য জল। দীর্ঘ তাল গাছ সব কিছু ছাড়িয়ে আকাশের বুকে বিঁধেছে। সব সময়, সব জায়গায় বুকভরা ভাষাহীন বেদনা আর নিস্তব্ধতা, জড়তা আর মৃত্যুর আভাস। যে বেদনা আর হতাশা

তুমি দেখতে পাও আমাদের প্রেমে, আমাদের সমাজে, সাহিত্যে, সংগীতে—তার জন্ম আমাদের এই গ্রামে। তারপর সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে।

প্রথম যখন তাকে দেখলাম তখনই আমার চোখে সে ধরা পড়ল অপরূপ সুন্দরীরূপে—জলপরীর মত। সে সমুদ্রে সাঁতার কাটছিল। আর আমি বালুতটের উপর বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম একটা নতুন সুর ভাঁজতে ভাঁজতে। হঠাৎ একটা মিষ্টি গলার ডাক শুনলাম "সরে যান ওখান থেকে, আমি উঠব।" সমুদ্রের দিকে তাকালাম। ঝিকিমিকি কালো চুল আর ঝলমলে একখানা হাসিমাখা মুখ। আর বহুদূরে দিগন্তরেখায় একখানা নৌকো। সূর্যের আলোয় রূপোর পাতের মত শাদা পালখানি ঝকঝক করছে।

আমি বললাম, "সাত সমুদ্রের ওপার থেকে বুঝি এলে?"

সে হেসে উঠল "না, এই গ্রামেই আমার বাড়ী। ঐত আমার বাবার নৌকা। মাছ ধরতে গেছেন। আর আমি তার জন্যে ভাত এনেছি: ঐ তো যে দিকে যাচ্ছেন ওই তাল গাছের কাছে ভাত রয়েছে। আমার শাড়ীও ওখানে।"

বলেই ঝলমলে বুদ্বুদের রেখা তুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে, ডাঙার দিকে এগিয়ে এসে বললো; "দয়া করে ঐ দিকে যানতো। আর শাড়ীটা আমায় এগিয়ে দিন।"

"কিন্তু একটি সর্তে।"

"কি?"

"ভাত আর মাছ আমিও খাব। বড় ক্ষিদে পেয়েছে!"
সে হেসে উঠল। তারপর মুক্ত তীরের মত জলের উপর রেখা টেনে টেনে ছুটে গেলো ঠিক যেখানটিতে নীল সমুদ্রে সূর্যের রশ্মি আলোর জাল বুনেছে। তারপর সে ফিরলো; তীরের দিকে সাঁতার কেটে এলো। কিন্তু এবারে এলো আস্তে আস্তে ছোট্ট মেয়ের মতো খেলা করতে করতে।
"তোমার হল কি?" জিজ্ঞাসা করলাম।
"আজকাল চাল বড় আক্রা। টাকায় মাত্র দু সের। ভাত ত খেতে দিতে পারবো না।"
"তাহলে কি খাব। আমার ভয়ংকর............
"খান তাহলে নোনা জল।" সে ঠাট্টা করে আবার গভীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার ঘরে বউ হয়ে যখন সে এলো চাল তখন টাকায় দু সের। আর মাইনে আমার পঞ্চাশ টাকা। বিয়ের আগে ভোর বেলা উঠতে হোত; নিজের হাতে রাঁধতে হোত। কারণ জমিদারের মেয়ের ইস্কুল সকালে। তার আগেই তাকে সেতার শেখাতে হবে। সন্ধ্যাবেলায় দু ঘণ্টা শেখাতাম। দিনের বেলায় যখন খুসী ডেকে পাঠাতেন জমিদার। বলতেন "বাজাও একখানা, কেমন যেন ঝিমিয়ে যাচ্ছি।"
তারপর এই পৃথিবীতে এলো আমাদের এই ছোট্ট সন্তান... ...কাছে এসো মা মণি...... আচ্ছা একটু হাসি দেখিয়ে দাও ওদের। ওদের বলো, "আমি কোনও দোষ করিনি। দু বছরও বয়স হয়নি আমার। আমি চাই ঝুমঝুমি আর পুতুল নিয়ে খেলতে।

মায়ের বুকের দুধ খেতে আর তারই কোলে ঘুমুতে। আমি এত নিষ্পাপ যে নিজের কথা বলতেও শিখিনি। আমি শুধু জানি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে যেখান থেকে বিধাতা আমাকে পাঠিয়েছেন বাপ মায়ের ঘর হাসিতে উজ্জ্বল করে তুলবার জন্য, এই স্যাঁতসেতে অন্ধকার ঘরখানা আমার কচি হাসিতে ভরিয়ে তুলবার জন্য।"

·········এসো মা মণি। দেখিয়ে দাও তোমার হাসি।

হ্যাঁ যা বলছিলাম, এই মেয়ে যখন হল তখন চাল টাকা টাকা সের। তবু আমরা ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়েছি, যাঁর দয়ায় ধান জন্মায়, আর জমিদারের পায়ের ধুলো নিয়েছি যাঁর দয়ায় সেই চালের ভাত খেতে পাই।

আসল কথা হল এই যে, এই ফসল জন্মানো আর খাওয়ার মাঝখানের ইতিহাসটা হল মানুষের বিবর্তনের সমগ্র ইতিহাস, তার সংস্কৃতি, সভ্যতা, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্যের খাঁটি ব্যাখ্যা। (ফসল) জন্মানো আর খাওয়া। দুটি অতি সহজ কথা। কিন্তু ভাবো ত একবার মাঝের ব্যবধানের কথাটা।

টাকায় এক সের চাল।

তারপর হ'ল টাকায় তিন পো।

তারপর আধ সের।

এক পোয়া।

তারপর চাল উধাও হ'য়ে গেল। গাছের ফল ফুরিয়ে গেল। তরিতরকারি নেই, মাছ নেই, নারকেল পর্যন্ত নেই। লোকে

বলাবলি করত জমিদার আর মহাজনের হাতে নাকি অনেক চাল। কিন্তু কোথায়? কেউ জানে না। চালের জন্য সব কিছু করা হ'ল। অনুনয়, আবেদন, খোসামোদ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা, ভগবানকে অভিশাপ সব কিছু। সবই করে দেখা গেল কিন্তু ফল কিছু হল না। সব গেল, রইলো শুধু ভগবানের নামটা— আর রইলো মহাজনের আড়ৎ আর জমিদারের কাছারী।

জমিদার সেতার শেখানো বন্ধ করে দিলেন। মানুষ মরছে উপোস করে, গান শুনবে কে? সেতার শেখাবার জন্যে পঞ্চাশ টাকা করে কে খরচ করবে?

ক্ষুধা, হতাশা আর একটি দুধের শিশু। স্ত্রীকে বললাম, "চলো কলকাতায় যাই। লক্ষ লোকের বাস। হয়ত একটা কাজ পেয়েও যেতে পারি।"

"চলো কলকাতায় যাই।"

"চলো কলকাতায় যাই।" সারা গ্রামটাই ওই এক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গ্রাম জীবনের নিবিড় যোগ যেন একটা দুর্জয় বাঁধ। হঠাৎ 'কলকাতায় চলো' রব ফাটল ধরিয়ে দিলো সেই বাঁধের গায়ে আর সমস্ত মানুষ ছুটে চললো অবিরাম স্রোতের মত। 'কলকাতা চলো' সবার মুখে ওই একটি মাত্র কথা। 'কলকাতা, কলকাতা চলো।'

নিয়তির পথ ধরে হাজার হাজার মানুষ এগিয়ে চললো; যে পথ বাংলার সীমান্ত জেলাগুলোর ভেতর দিয়ে অবশেষে কলকাতায় এসে পৌঁচেছে। এই পথ জনস্রোতের কাছে একমাত্র প্রাণরেখা।

"কলকাতা; কলকাতা চলো"……পিঁপড়ের ফৌজ চলেছে গুড়ি মেরে মৃত কলকাতার উদ্দেশ্যে অন্নের অভিসারে ।……মৃত্যুর মিছিল—মাথার উপরে পাক খেয়ে ঘুরছে শকুনির পাল, নধর পরিতৃপ্ত অলুক্ষুণে সব পাখী, খাদ্যের অভাব নেই তাদের।" বাতাসে কেবল গলিত মাংসের গন্ধ, মেয়েদের হাহাকার আর শিশুর কান্না। প্লেগে মরা ইঁদুরের মতই শকুনি, শেয়াল আর বুনো কুকুরের জন্যে মৃতদেহগুলো পথের দু পাশে ছড়ানো। কিন্তু পিঁপড়ের ফৌজ এগিয়েই চললো। তারা এসেছে বাংলার সকল প্রান্ত থেকে। সবাইর লক্ষ্য কলকাতা। "কলকাতা! কলকাতা চলো !!"

কে কাকে সাহায্য করে? কেমন করেই বা করে? প্রত্যেকটি মানুষ নিজেকে বাঁচাবার জৈবিক প্রয়োজনে আদিম বর্বরতায় পিছিয়ে গেছে। ক্ষুধা! হতাশা! মৃত্যু! আর এই মানুষ পিঁপড়ের দল চলেছে, ঘসে ঘসে পা ফেলছে; শতজীর্ণ, শীর্ণ দেহটাকে টেনে নিয়ে চলেছে। নিজেরাই মারামারি করছে; কাতরাচ্ছে, চীৎকার করছে; কাশির সঙ্গে উঠে আসছে রক্তের ঢেলা—তারপর ফেলছে শেষ নিশ্বাসটুকু। পিঁপড়ের পালের মতই নিয়মের অভ্যাস আর সহিষ্ণুতাটুকুও যদি থাকত। পিঁপড়ে ইঁদুরও এমন বীভৎসভাবে মরে না।……

চলতি পথে এখানে ওখানে মিলেছে দাক্ষিণ্যের ছিটে ফোঁটা। কিন্তু দাক্ষিণ্যে তো সমস্যার সমাধান হয় না, প্রাণ কি সে ফিরিয়ে দিতে পারে? ও শুধুই ধোঁকা দেয়—যে দেয় তাকেও, যে নেয় তাকেও।

কখনো কখনো ভিক্ষে পেতাম। একদিন পেলাম একটা আস্ত নারকেল। মেয়েটা কতদিন ধরে দুধের জন্যে কাতরাচ্ছে। আর তার মা'র বুক হয়েছে যেন শুক্‌নো মাটি, কত বছর তাতে একটি ফোঁটা জলও ঝরে নি। তার দেহ যেন একটা শুক্‌নো ফুল। মেয়েটাকে চুপ করাবার জন্যে তার হাতে গুঁজে দিত ঝুমঝুমিটা। এই কাঠের খেলনাটা ছিল তার আদরের জিনিস। শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরত সেটা। সেদিনও তার হাতে ছিল ঐ ঝুমঝুমি। মায়ের কাঁধে মাথা রেখে করুণ মুখে কাঁদছে। যেমন করে ভয়ার্ত আহত পশু কাতরায়, যতক্ষণ না মরণ এসে সব জ্বালা জুড়িয়ে দেয়।......

বলছিলাম, সেদিন পেয়েছি একটা পুরো নারকেল। জলটা দিলাম মেয়েকে আর নিজেরা খেলাম শাঁসটুকু। মুহূর্তের জন্য মনে হল পৃথিবীটা যেন নতুন করে জন্ম নিল আরেকবার।

"কলকাতা! কলকাতা চলো।" সেই অফুরন্ত দীর্ঘ পথ বেয়ে তখনো চলেছি। এখন আর কারুর কাছে কিছু নেই। যার যা ছিল হয় বেচে দিয়েছে নয় বদল করেছে। বাকী শুধু মানুষের ব্যবসা। উত্তর ভারত থেকে এসেছে মানুষ কেনবার খরিদ্দার। তাদের মধ্যে আছে অবলা আর অনাথ আশ্রমের ম্যানেজার--অবলা আর অনাথ চাই তাদের। বাপ-মায়েরা নিজের হাতে সন্তানকে ধরে দিচ্ছে অনাথ বলে সেই সব ম্যানেজারদের হাতে। অনাথ হল তারাই যারা দরিদ্রের শিশু—বাপ-মা বেঁচে আছে কি মরে গেছে সেটা একান্তই গৌণ। এদের ভেতর সত্যিকারের মানুষের

ব্যাপারীও আছে—যাদের কোন নীতির ভণ্ডামি নেই, ধর্মের ধাপ্পা নেই, যারা কোন সামাজিক অজুহাতের ধার ধারে না। হাটের গরু ভেড়ার মত মেয়েগুলোকে তারা পছন্দ করে বেছে নিলো।

"খাসা মাল দেখছি।"

"রংটা একটু ময়লা।"

"বড্ড কাহিল।"

"মুখে আবার বসন্তের দাগ।"

"মাংস কইগো গায়ে, হাড়ই সার।"

"থাকগে ওতেই চালিয়ে নেবে ছুঁড়ি।"

"দশ রূপয়া—ব্যস, যাস্তি-হো গিয়া।"

স্বামী বিক্রী করল স্ত্রীকে, মা বেচে দিল মেয়েকে, ভাই বিক্রী করল বোনকে। অথচ আজকের এই দুর্দশার আগে কোনও দিন এই সব দালাল আর বেশ্যাখানার মালিকদের এই ধরনের শুধু কোন ইঙ্গিত করবার স্পর্ধা হ'লেই খুন করে ফেলতো এরা। কিন্তু আজ তারা ঘরের মেয়েদের শুধু বেচেই দিচ্ছে না, নির্লজ্জ দোকানদারের মত যে যার মালের গুণকীর্তন করছে, খরিদ্দারকে খোসামোদ করছে। একটি পয়সার জন্য দর কষাকষি আর কাড়াকাড়ি করছে। ধর্ম, নীতি, আধ্যাত্মবাদ, মাতৃত্ব—মানবতার সমস্ত আদর্শ আজ উলঙ্গ। জীবন দাঁড়িয়েছে তার জৈবিক নগ্নতায়—ক্ষুধার্ত, রক্তপিপাসু, নিষ্ঠুর আর ভয়ংকর বনের পশুর মত।

স্ত্রী বলল, "আমাদের মেয়েটাকেও বিক্রী করলে হয় না!"

ভয়ে ভয়ে, লজ্জিত মুখে, মাটির দিকে তাকিয়ে সে কথাগুলো উচ্চারণ করে সেই মুহূর্তেই স্তব্ধ হ'য়ে গেল। আড় চোখে সে একবার তাকালে আমার মুখের দিকে, দেখলো তার কথার চাবুক আমার কেমন লাগলো। তার চোখে অপরাধীর লজ্জা, যেন সে নিজে তার মেয়ের গলা টিপে মেরেছে; তার স্বামীর জামা খুলে তার খালি পিঠে চাবুক মেরেছে, যেন সে তার নিজের গলায় দড়ির গেরো পরিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

আজ সে মারা গেছে বলে কোনও নালিশ জানাব না। যখন সে ও কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছিল তখনই তার সত্যিকারের মৃত্যু হয়েছে। হয়ত উচ্চারণ করবার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত—আমার মৃত্যুর পরেও আমি বুঝে উঠতে পারি না, তার মুখ থেকে কেমন করে ও কথা বেরুলো, কেমন করে এ সম্ভব হল? কোন নিদারুণ শক্তি তার মাতৃত্বকে, হত্যা করেছিল, তার আত্মাকে চূর্ণ করে দিয়েছিল? আজও আমার মনে পড়ে তার কোল থেকে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়ে, তার দিকে ক্রুদ্ধ, তিক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম। কিন্তু আমার ক্রোধ আর বিরক্তি যেন তাকে স্পর্শ করল না। আমার পিছন পিছন অন্ধের মত, কলের মত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসতে লাগলো। ধূলোয় তার রুক্ষ চুলে জট ধরেছে; শাড়ীখানা শতছিন্ন, ডান পায়ের ঘা ফেটে রক্ত পড়ছে। তার সেই চোখ, তিন বছর আগের সেই জলপরী আজ কোথায়? সেই তন্বী, লাবণ্যময়ী নারী যাকে দেখেছিলাম সোনালী মাছের মত সমুদ্রে সাঁতার কাটছে?......সেই অনুপম

রূপ যার মধ্যে জড়ো হয়েছিল তাজমহলের সমস্ত মহিমা, ইলোরার মায়া, আর অশোকের শিলালিপির অমরত্ব।

সে আজ কোথায়? কেন আজ এই রূপ, এই প্রাণ, এই মাতৃত্বের গৌরব পথের ধূলোয় পায়ে-দলা বিকৃত শবের মত পড়ে আছে? ······এ যদি সত্যি হয় যে নারী এক পরম বিস্ময়, এ যদি সত্যি হয় যে নারীই বিশ্বাস, নারীই জীবনের উৎস, জীবনের সত্য তবে আজ বলব যে এই সত্য, এই বিশ্বাস, এই পরম বিস্ময়ের উৎস এক কণা চাল, যা না হ'লে তার মৃত্যু অনিবার্য।

কোলে মাথা রেখে আমার জলপরী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। ক্লান্ত আর ধূলো-মাখা নোংরা দেহ এলিয়ে সেই পথের ধারেই চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়ল। বার কয়েক চাপা কান্নার দমক— তারপরেই দেহ ছেড়ে চলে গেল তার প্রাণ।

কেন জানি না; কেমন করে তাও বলতে পারবো না—মন চলে গেল অনেক পিছনে যে মুহূর্তে তাকে সর্বপ্রথম চুমু খেয়েছিলাম, আর তার দেহ-গন্ধ মনে করিয়ে দিয়েছিল যুঁইফুলের সৌরভকে। তার মৃত্যুর মুহূর্তেও সেই একই সৌরভই ভেসে এলো। চোখ জলে ভরে উঠল। তার মরা ঠোঁট দুটোর দিকে মুগ্ধের মত তাকিয়ে রইলাম। জল ঝরে পড়তে লাগল সেই ঠোঁট দুটোর উপর; তার চোখ আর গালের উপর। মাত্র উনিশ বছরে, না খেয়ে, অগাধ তৃষ্ণা বুকে নিয়ে; ধূলো মাখা দেহে, শতজীর্ণ কাপড় পরনে, আমার কোলে মরে পড়ে আছে। সেই জলপরীকে মরবার সময় আজ ডাইনীর মত দেখাচ্ছে। মৃত্যুর বিরুদ্ধে আমার কোন

নালিশ নেই ; ভগবানের বিরুদ্ধেও নেই। সেই যে অন্ধ মিছিল যারা নির্লিপ্তের মত পাশ কাটিয়ে চলে গেল ওই পথ বেয়ে—তাদের বিরুদ্ধেও কোন নালিশ নেই। শুধু যদি এমনি করে সে না মরত! আমি শুধু পৃথিবীর সম্রাটদের জিজ্ঞাসা করতে চাই ; এমন কি সে করেছে যার জন্যে এই হ'ল তার পরিণাম?

সাধারণ ছোট্ট একটা ঘর, স্বামী আর সন্তান, সাধারণ জীবনের মোটা সুখ—এই নিয়ে যদি সে সাধারণ মানুষেরই মত পুরো জীবনটা বেঁচে থাকত তবে কার কতটুকু ক্ষতি হ'ত? এই রকমই লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়েছে যারা জীবনে বেশী কিছু আশা করে না—মান চায় না, ধন চায় না, সাম্রাজ্য কিংবা ঋষিত্ব চায় না, —অথচ এই সামান্য সুখ থেকেই বঞ্চিত হয় তারা। সে তেমনি বঞ্চিত হয়েছে। এমনভাবে তাকে কেন মরতে হ'ল? যদি মরতেই হয়, তবে তার নিজের গ্রামে, সমুদ্রের সীমানায়, তালের ডালে কাঁপা বাতাসে তার শেষ নিশ্বাসটুকু ফেলতে পারলো না? তাকে কি মরতে হলো এমনি জঘন্যভাবে ; এই মৃত মানুষের অরণ্যে যেখানে চারদিকে জীবিতের কাতরানি, শ্রান্ত, ক্লান্ত পা ফেলার শব্দ আর বহুদূর থেকে ভেসে আসা ক্ষুধার্ত কুকুরের চীৎকার?

আমি তাকে কবর দিইনি। তাকে পুড়িয়ে আসি নি। তাকে রাস্তার উপর ফেলে রেখেই মেয়েটাকে কোলে তুলে এগিয়ে চললাম।

কলকাতা তখনো বহুদূরে—মেয়েটিও কয়দিন কিছু খায়নি। সে

আর কাঁদতেও পারে না। গলা থেকে কোন শব্দ বেরোয় না। ডাঙায় তোলা মাছের মত ঠোঁট দুটো ফাঁক করে আবার বুজিয়ে ফেলার সাধ্যটুকুই তার আছে। এই ছোট জলপরীর হাতে কিন্তু তখনো ধরা আছে সেই কাঠের ঝুমঝুমিটা। নিভে আসা প্রদীপের মত চোখের সামনে মরে যাচ্ছে। অথচ আমার করবার কিছুই নেই আমি তখনো এগিয়ে চলেছি। আমার সামনে মানুষ, পিছনে মানুষ, ডাইনে-বাঁয়ে মানুষ চলেছে। মৃত্যুর মিছিল। প্রত্যেকেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে; প্রত্যেকে পার হ'য়ে চলেছে সেই হতাশার বন্ধুর উপত্যকা। প্রত্যেক জোড়া চোখে, প্রত্যেকটি মুখে প ড়েছে একই ছায়া ……আমি আকাশের দিকে তাকালাম হাত জোড় করে প্রার্থনা জানালাম; হে বিধাতা, হে আকাশ মাটির স্রষ্টা, এই নিষ্পাপ শিশুর দিকে তাকাও। …হে জগতের প্রভু, হে অন্নদাতা, তোমার এই বিরাট রাজত্বে এক ফোঁটা দুধ, কি এক মুঠো অন্নও জুটবে না এই শিশুর ভাগ্যে? দেখো দেখো, এর দিকে তাকিয়ে দেখো, কেমন করে শুকনো মুখখানা হাঁ করছে আর তার পরে ই বন্ধ হয়ে আসছে, দেখো ক্ষিদের জ্বালায় তার শরীরটা বেঁকে যাচ্ছে—হে ভগবান, লোকে বলে মরণ নাকি সুন্দর। কিন্তু নিশ্চয়ই এ মরণ সুন্দর নয়। এই শিশুর অনেক ভালভাবে মরা উচিত—হে ধ্বংসের দেবতা, এ আধ ফোটা কুঁড়িকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবার জন্যে একটা ঝলমল করা বুদ্বুদের মত, ঢেউয়ের বুকে দোলা নৌকার মত, গানের উঁচু পর্দার মত, তালের সারির ছায়ায় প্রথম চুম্বনের মত এই অপরূপ স্বপ্নকে চুরমার করে

দেবার জন্য এত উদগ্রীব কেন তুমি ?   হে নিষ্ঠুর অন্ধ বিধাতা, এর কি কোন মূল্য নেই ?

প্রার্থনা, অভিশাপের কোনই ফল হল না। আমার মেয়ে মারা গেল। সেই শেষ মুহূর্তের কি ভয়ংকর যন্ত্রনা! আমার এই মৃত পাথরের মত চোখ দুটোকে জিজ্ঞাসা করো, তারা বলবে কি দৃশ্য দেখেছিল। এক ফোঁটা দুধের জন্যে ককিয়ে ককিয়ে সে মারা গেল।

আকাশ থেকে এক ফোঁটা দুধ ঝরে পড়ল না। মাটির বুক থেকে এক ফোঁটা দুধ উঠে এলো না। নির্মম আকাশ। নির্মম মাটি। আর সামনে এই দুস্তর প্রাণহীন নির্মম পথ।

মরবার কয়েক মুহূর্ত আগে সে আমাকে দিয়েছিল তার হাতের ঝুমঝুমিটা। এই যে আমার হাতের কঠিন আঙুলের মুঠোয় ধরা। এই তার সম্পদ সে আমাকে দিয়ে গেছে। না, সে এমন সরল বিশ্বাসে আমার হাতে এটা দিয়েছিল যে আমার স্থির বিশ্বাস সে আমাকে ক্ষমা করে গেছে। আমাকে দিয়ে গেছে পুরস্কার। সস্তা দামের একটা কাঠের ঝুমঝুমি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যদি সে ক্লিওপেট্রা হত তবে আমাকে দিত তার সমগ্র প্রেম, যদি মমতাজ হত তবে আমাকে দিয়ে যেত তাজমহল, যদি সে রানী ভিক্টোরিয়া হত তবে দিয়ে যেত তার সমগ্র সাম্রাজ্য। কিন্তু ছোট এক অভাগা শিশু। তার থাকবার মধ্যে ছিল মাত্র কাঠের এক ঝুমঝুমি। তা-ই সে দিয়ে গেছে তার সবহারা বাপকে। কে আছো যে এই কাঠের খেলনার দাম যাচাই করতে পার? তোমরা যারা বড়

মানুষের তুচ্ছ ত্যাগের ঢাক পেটাও, তারা নিয়ে যাও এই কাঠের ঝুমঝুমি। একে প্রতিষ্ঠা করো মানবতার মন্দিরে; যে মন্দির একদিন আমার আত্মা গড়ে তুলবে তোমাদের জন্যে।

অবশেষে কলকাতা। উপবাসী, জনহীন নগরী। প্রাণহীন, নির্মম নগরী। আশ্রয় নেই, এক মুঠো অন্ন নেই। শিয়ালদা স্টেশন, শ্যামবাজার, বড়বাজার, হ্যারিসন রোড, জ্যাকারিয়া ষ্ট্রীট, বৌবাজার, সোনাগাছি, নিউ মার্কেট, ভবানীপুর—কোথাও এক কণা ভাত মেলেনি। কোথাও মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করেনি। উপবাসী মানুষ আড়ম্বরপূর্ণ হোটেলের সামনে মরে পড়ে আছে। একই ডাস্টবিনে কুকুর আর মানুষ অন্ন খুঁজছে। উচ্ছিষ্টের অংশ নিয়ে মানুষে কুকুরে লড়াই চলছে। আর বিদ্যুতের ঝলকের মত বিপুলাকার মোটর ছুটে চলেছে—ভেতরে হাসির ফোয়ারা।

নগ্ন উপোসী দেহে বেরিয়ে পড়া পাঁজরের হাড়গুলোকে মনে হয় লোহার শেকল। ওই শেকলে কেন প্রাণকে বেঁধে রেখেছ? বেরিয়ে যাক সে প্রাণ। এই ভয়াবহ কারাগারের দরজা খুলে দাও…………বিদ্যুতের ঝলকের যত আরেকটা মোটর ছুটে যায়। কিন্তু দেহ তো আত্মার কান্না শোনে না।…মা মরছে; ছেলেরা ভিক্ষে করছে। স্ত্রী মরছে আর স্বামীটি ঘ্যান ঘ্যান করছে—রিক্স-চড়া সাহেবের কাছে পয়সা চাইছে। যুবতী মেয়েটি একেবারে উলঙ্গ। কিন্তু তার খেয়ালই নেই যে সে উলঙ্গ কিংবা সে যুবতী। এমন কি সে জানেও না যে সে নারী। সে শুধু জানে সে ক্ষুধার্ত। ক্ষুধা সৌন্দর্যকে হত্যা করেছে।

এই দূতাবাসের সিঁড়ির ধারে আমি মরছি। আমি প্রলাপের ঘোরে আচ্ছন্নের মত পড়ে আছি। কারা যেন এল, কাছে দাঁড়াল। তারা আমাকে তাকিয়ে দেখছে। হঠাৎ কানে এল অস্পষ্ট ফিস ফিস কথা ; "হারামীকে মনে হচ্ছে হিন্দু। চল্ যাই।"

ওরা চলে গেল……অন্ধকার নেমে আসছে।……

আবার কারা যাচ্ছিল। আমাকে দেখে ফিরে দাঁড়াল। "কে তুমি ?" কেউ জিজ্ঞাসা করল।

অনেক কষ্টে ভারী ঠোঁট দুটো তুলে উত্তর দিলাম "আমি ক্ষুধার্ত।"

"হারামজাদা মুসলমানের মত দেখতে।"

ক্ষুধা ধর্মকেও হত্যা করেছে।

চারদিকে অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার। আলোর চিহ্নমাত্রও নেই ; নিস্তব্ধ। গভীর সর্বব্যাপী নির্জনতা।

হঠাৎ আনন্দের শঙ্খ ঘন্টা বেজে উঠল মন্দিরে মন্দিরে ; গির্জায় গির্জায়। সারা পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো মধুর আনন্দ কলস্বরে। খবরের কাগজ হাতে হকার চেঁচাচ্ছে দিনের সেরা খবর :

"তেহারাণে ত্রিশক্তির মিলন…নতুন পৃথিবীর জন্ম"

নতুন পৃথিবীর জন্ম !

আনন্দিত বিস্ময়ে আমার চোখ দুটো বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো। সমস্ত ইন্দ্রিয় হ'য়ে গেল স্তব্ধ।

সেই থেকেই বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ'য়ে আছে আমার চোখ দুটো। আমি রাজনীতিক নই। আমি একজন সেতার বাজিয়ে। আমি

শাসনকর্তাদের কেউ নই। যারা শাসন মেনে চলে আমি তাদেরই একজন। কিন্তু কোন দরিদ্র সংগীতজ্ঞের হয়ত প্রশ্ন করবার অধিকার আছে: আমাদের মত দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা দরিদ্র, যারা উপবাসী, যারা শোষিত—তাদেরও কোন হাত থাকবে কি এই নতুন পৃথিবী গড়ে তোলবার কাজে?

এ প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা করছি কারণ ত্রিশক্তির নতুন পৃথিবীতে আমিও বাঁচতে চাই; আমি তো ঘৃণা করি ফ্যাসিবাদ, ঘৃণা করি অত্যাচার আর অন্যায়কে।...

আমি রাজনীতিক নই। কিন্তু সংগীতবিদ হিসাবে এইটুকু বুঝি যে যে গানে আছে বেদনার সুর, সে গান শ্রোতাকেও ব্যথাতুর করে তোলে। যে মানুষ ক্রীতদাস সে অন্যকেও দাস করে তোলে। পৃথিবীর পাঁচজনের একজন মানুষ হচ্ছে ভারতীয়। যে শৃঙ্খলে প্রত্যেকটি ভারতবাসী বাঁধা আছে অন্য চারজন পৃথিবীর মানুষ তার জন্যে ব্যথা পায় না, এ হতেই পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সেতারের একটা তার বেসুরো থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত রাগিনী বেলয়, বেতালে বাজতে থাকে। যতদিন একটি মানুষ উপবাসী থাকবে ততদিন পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবী থাকবে উপবাসী। যতদিন একটি মানুষ দরিদ্র থাকবে, প্রত্যেকেই ততদিন পর্যন্ত দরিদ্র থাকবে। যতদিন পর্যন্ত একটি মানুষ পরাধীন থাকবে এ পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ ততদিন পর্যন্ত শৃঙ্খলিত থাকবেই।

এই জন্যেই আমার এ জিজ্ঞাসা। ভেবো না আমি মরে গেছি। যদি মরবার হয় তবে তুমিই মরেছ। আমি বেঁচে আছি। আর

:চোখ দিয়ে এই কথাই জিজ্ঞাসা
দেবো। তোমার মধুর স্বপ্নকে
রব। আমি তোমার জীবনকে
া কইতে পারবে না। তুমি
পারবে না। আমার প্রশ্নের
ত দিন না আমার মনের মত
। আমি মরতে পারি না।
শুধু আ
র ধারে
ঃ করি